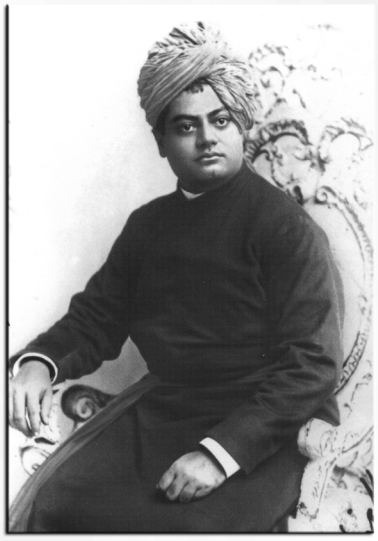

স্বামী বিবেকানন্দ ও নব কর্মসংস্কৃতি

সুদীপ বসু

এক

নব কর্মসংস্কৃতির দ্বারোদ্‌ঘাটন

কর্মসংস্কৃতি শব্দটি ইদানীংকালে অতিব্যবহারে ক্লিশে হয়ে গেছে। অথচ এটি জ্ঞাত সত্য যে, কর্মের সঙ্গে মানবজীবন অঙ্গাঙ্গি জড়িত। জীবনের প্রতি পলে মানুষকে কর্ম করতে হয়। তাই কর্মসংস্কৃতি শব্দটি মানুষের কর্মময় জগতে নতুন কোন বাতাবরণ তৈরি করবে? এক্ষেত্রে বলা যায় কর্মের মধ্যে নতুন মাত্রা আনাই কর্মসংস্কৃতির লক্ষণ। একজন মানুষ কর্ম করবে, এই স্বাভাবিক ব্যাপারটিকে সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ কর্মের পরিধি এখন বহুব্যাপ্ত, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতীয় জীবন। কর্মসংস্কৃতি এখন জাতীয় সংস্কৃতিতে পরিণত।

কিন্তু কর্মসংস্কৃতিকে যতটা আধুনিক চিন্তার ফসল আমরা ভাবি সত্যই কি তাই? বিষয়টি কার্যত হয়ে দাঁড়িয়েছে নতুন মোড়কে পুরোনো বস্তু। কেননা স্বামী বিবেকানন্দই প্রাচীনপন্থী ভারতবর্ষে এই আধুনিক কর্মসংস্কৃতির প্রবর্তক। এ-সত্য উচ্চারণে দ্বিধার কোনও কারণ নেই। কিন্তু নতুন চিন্তার অবকাশ আছে। বিরজা হোম করে গৃহী থেকে সন্ন্যাসী যিনি হয়েছেন তিনি ধ্যানের জগৎ সরিয়ে রেখে কর্মের বন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন কেন? ভারতবর্ষে অন্তত সন্ন্যাসীর কর্ম (কিংবা ধর্ম) আর গৃহীর কর্ম আলাদা। সন্ন্যাসী করবেন মোক্ষলাভের চেষ্টা আর গৃহী করবেন সন্ন্যাসীর সেবা। গৃহীর জন্যই নির্দিষ্ট করা আছে কর্মের জগৎ। এই প্রচলিত ছক ভেঙে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নবকর্মযজ্ঞের প্রবর্তন ঘটালেন। আত্মস্বার্থহীন কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হলে ধর্মজীবনে পূর্ণ প্রবেশাধিকার মেলে না—এটি তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ।[১] এই সূত্রে সন্ন্যাসী ও গৃহীর কর্মজীবনের তুল্যমূল্য বিচার তিনি করেছেন, যেখানে রয়েছে এই সুদৃঢ় ঘোষণা—প্রত্যেকেই নিজ অধিকারে শ্রেষ্ঠ, তাই একজনের কর্তব্য অপরের কর্তব্য নয়।[২]

বিবেকানন্দ এখানেই থেমে যাননি। গৃহীর কাছে সন্ন্যাসীর অন্নঋণের কথা স্মরণ করিয়েছেন (তেমন তিক্ত ভাষা কমই সম্ভব)।[৩] স্থির করেছেন, গৃহীর ঐহিক উন্নতির জন্যে মোক্ষলাভেচ্ছু সন্ন্যাসীকে নবধর্ম পালন করতে হবে, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' অর্থাৎ বহুজনের হিত ও বহুজনের সুখেই

সন্ন্যাসজীবনের সার্থকতা। কেবল ধ্যানযোগ নয়, কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করবেন সন্ন্যাসী, কর্মযোগের মাধ্যমে নতুন ধর্ম পালন করবেন—বিবেকানন্দের এই বোধের বাস্তব রূপায়ণের নাম রামকৃষ্ণ মিশন। কিন্তু তাঁর জীবন সীমায়িত ছিল। তাই তাঁর কর্মবাদী চিন্তা পাওয়া গেছে তাঁর কিছু চিঠিপত্র এবং লেখালিখির মধ্যে যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে তাঁর স্টেনোগ্রাফার জে জে গুডউইনের অসীম গুরুভক্তি এবং কর্মশক্তির কারণে। এর বাইরে মৌখিকভাবে কর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দ যেসব কথা বলে গেছেন তার খানিক স্মৃতিকথায় লভ্য, বাকি অংশ কালের গহ্বরে অবলুপ্ত।

ঠিক কোন সময় থেকে বিবেকানন্দের অন্তর্দেশে বা অন্তর্মানসে তাঁর কর্মপরিকল্পনা বা কর্মভাবনার কথা জাগ্রত হয়েছিল? গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধির আগে তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানদের সংগঠিত করার ভার প্রিয়তম শিষ্যের স্কন্ধে ন্যস্ত করেছিলেন।[৪] কর্মযোগে বিবেকানন্দের আকর্ষণের এটা একটা কারণ। বরানগর মঠে ক্রমান্বয় শাস্ত্রালোচনাও কর্ম সম্পর্কে তাঁর চেতনা নির্মাণ করেছিল। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রাথমিক আগ্রহ ছিলই মহাজীবনের রহস্যে ডুব দেওয়া। অন্তত ৪ জুলাই ১৮৮৯-তে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা পত্রে সেই ব্যাকুলতা দেখা গেছে।[৫] কয়েক মাস পরে ৩১ মার্চ ১৮৯০-তে প্রমদাদাস মিত্রকেই তিনি পুনশ্চ তীব্রতর ভাষায় একই কথা লিখেছেন। উত্তাল আবেগ আছাড়িপিছাড়ি খেয়েছিল বিবেকানন্দের মনস্তটে। সেকথা এই চিঠির শেষাংশে আছে : ''আমার মানসিক অবস্থা আপনাকে কি বলিব, মনের মধ্যে নরক দিবারাত্রি জ্বলিতেছে—কিছুই হইল না, এ জন্ম বুঝি বিফলে গোলমাল করিয়া গেল;... আমি দিবারাত্রি কি যাতনা ভুগিতেছি, কে জানিবে?''[৬] বালকের ব্যাকুলতায় এই প্রশ্ন সেদিন প্রমদাদাসকে স্পর্শ করেছিল। বিবেকানন্দের আবেগের আরও একটি ক্ষেত্র ছিল। মাসতিনেক পরে তিনি মনের গভীর আর্তি নিয়ে প্রমদাদাসকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন, যাতে ছিল গঙ্গাতীরে শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করার জন্য সহায়তা প্রার্থনা। অবশ্য প্রমদাদাসের উত্তরে 'দাস নরেন্দ্র' যে স্বস্তি পাননি, তার উল্লেখ আছে প্রবল অভিমানে লেখা প্রত্যুত্তরে : ''আপনার পরামর্শ অতি বুদ্ধিমানের পরামর্শ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি; তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে—বড় ঠিক কথা।''[৭]

হয়তো বিবেকানন্দ এখান থেকেই ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, হয়তো এখান থেকেই তাঁর উপলব্ধি—রমতা সাধুর জীবন তাঁর নয়। কিন্তু এরপরেও তিনি পরিব্রাজক—যখন হিমালয়ের নির্জন গুহায় সর্বোচ্চ অধ্যাত্ম-উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে পৌঁছচ্ছেন সাধারণ মানুষের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রুশকাষ্ঠ বহনের দায় তাঁরই কেননা রামকৃষ্ণ বলেছিলেন : ''নরেন শিক্ষে দিবে যখন ঘুরে বাহিরে হাঁক দিবে।'' তাই পরিব্রাজক অবস্থায় শতাধিক বছরের ব্রিটিশ শোষণে অন্নহীন, স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন, নীরক্ত এবং অন্যান্য সমস্যাভারে পীড়িত ন্যুব্জ (যার মধ্যে আছে বর্ণবৈষম্য, নারীর প্রতি চূড়ান্ত অসম্মান ইত্যাদি) জনগণের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন প্রতিভাবান এবং জ্ঞান ও কর্মে দীপ্ত এই তরুণ সন্ন্যাসী। জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার সংকল্প দৃঢ় হচ্ছিল তাঁর মধ্যে। এই মানুষগুলির কথা একালের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পেয়েছি : ''নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে।'' একই সত্য উচ্চারিত কবির গদ্য অভিভাষণ 'সভ্যতার সংকট'-এ : ''ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন-না-একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে?... আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম,

কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ!" রবীন্দ্রনাথের এ-উপলব্ধির বহু বছর আগেই বিবেকানন্দ এই ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন। তার ছবি ধরা আছে তাঁর চিঠিপত্র নামক ক্যামেরায়, সেইসঙ্গে কর্মযোগ সহ অন্যান্য রচনায়। শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর মহাসমাদরের পর উৎসাহে ফেটে পড়ে বিবেকানন্দ লিখেছেন : ''জীবনের প্রতিটি দিনে আমি যেভাবে প্রভুর করুণা পাচ্ছি, আমার ইচ্ছা হয়, ছিন্নবস্ত্রে ও মুষ্টিভিক্ষায় যাপিত লক্ষ লক্ষ যুগব্যাপী জীবন দিয়ে তাঁর কাজ করে যাই—কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর সেবা করে যাই।"[৮] খ্রিস্টান পাদরি, মিশনারি ও ব্রাহ্মদের চরম বিরোধিতার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি সংগ্রাম করেছেন অবিরাম। কিন্তু কখনই নিজ মিশন থেকে সরে আসেননি।

দুই
'ধর্ম' হচ্ছে কার্যমূলক

শিরোনামটি নিশ্চয়ই আমাদের ভাবায়। সন্ন্যাসীর ধ্যানজপাদি কর্মের কথা অবশ্যই বিবেকানন্দ এখানে বলেননি। তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন রামকৃষ্ণের নতুন বার্তার দ্বারা—খালি পেটে ধর্ম হয় না। নবযুগের চরিত্র যেন বয়ে নিয়ে এল এই বাক্যটি। বিবেকানন্দ কেন বারবার মনে করিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে যুগসূচনা, তার উত্তর এইখানে আমরা পাব। এইকাল মানবসভ্যতার সন্ধিক্ষণ। বিজ্ঞানের এবংবিধ উন্নতি পূর্ববর্তী কোনও অবতারপুরুষের জীবনকালে দেখা যায়নি। আবার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার টানাপোড়েন, একই সভ্যতার মধ্যে নানা ভাঙাগড়ার শুরুও একইকালে। বিশেষত পরাধীন দেশে মানুষের নিম্নগামী অবস্থার সম্মুখীন আর কোনও অবতার হননি। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ যে-নতুন বার্তা দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ সেই মহাবাণীকেই নব কর্মসংস্কৃতির আকারে প্রকাশ করেছেন। সেটি তাঁর ওই কথা ('ধর্ম হচ্ছে কার্যমূলক') স্মরণ করলেই বোঝা যায়। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত উপরের কথাটির সঙ্গে আরও কিছু কথা বিবেকানন্দ বলেছেন। সেই বাক্যগুলিও মনে রাখা দরকার। কোন কর্মপথে অগ্রসর হলে গৃহীর পক্ষে সঠিক ধর্মজীবন যাপন করা সম্ভব, তা বিবেকানন্দ এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন : ''ধার্মিকের লক্ষণ হচ্ছে সদা কার্যশীলতা। এমন কি, অনেক মীমাংসকের মতে বেদে যে স্থলে কার্য করতে বলছে না, সে স্থানগুলি বেদই নয়... দেখতে পাচ্ছ যে, লাখো লোক ওঁকার জপে মরছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত 'প্রভু যা করেন' বলছে এবং পাচ্ছে—ঘোড়ার ডিম। তার মানে বুঝতে হবে যে, কার জপ যথার্থ হয়, কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ, কে শরণ যথার্থ নিতে পারে—যার কর্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, অর্থাৎ যে 'ধার্মিক'।"[৯]

শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে (বিবেকানন্দ বিলক্ষণ জানতেন শাস্ত্র উদ্ধার না করলে দেশের লোকে ঘাড় কাত করবে না) বিস্তৃতভাবে ওই কথাগুলিই তিনি বলেছেন কর্মযোগ গ্রন্থে যেখানে পরিবারের প্রতি গৃহীর কর্তব্য উল্লিখিত।[১০] সেখানে আছে জ্ঞানলাভ এবং অর্থোপার্জনের জন্য গৃহীর সদা সচেষ্ট থাকার কথা যার একটি বাক্য : ''যদি কোন গৃহস্থ অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করে, তাহাকে দুর্নীতিপরায়ণ বলিতে হইবে।"[১১] বিবেকানন্দের পুনশ্চ মন্তব্য : ''নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়।"[১২] গৃহীর ধর্ম সাম-দান- দণ্ড-ভেদ। সে-কাজ যিনি করেন না তিনি গৃহী-ই নন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থেও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ পুনশ্চ গৃহীকে তার ধর্ম স্মরণ করালেন।[১৩] যা তিনি বলেছেন (এক্ষেত্রে যা লিখেছেন) তা কোনও সন্ন্যাসীর মুখে উচ্চারিত হতে পারে তা বিশ্বাস করা কঠিন : ''জোর করে দুনিয়াসুদ্ধকে ঐ মোক্ষমার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন? ঘষে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে পিরীত কি

হয়?... তুমি যে এ দুনিয়াটা একটু ভোগ করবে, তার কোনও রাস্তা নেই, বরং প্রতিপদে বাধা।"[১৪]

"বৌদ্ধরা বললে, 'মোক্ষের মতো আর কি আছে, দুনিয়া-সুদ্ধ মুক্তি নেবে চল।' বলি, তা কখন হয়? 'তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ওসব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম কর'—এ-কথা বলেছেন হিঁদুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে! কাজের কথা? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে একবুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পার না—মোক্ষ নিতে দৌড়ুচ্ছ!!"[১৫] তার ফল দাঁড়াল "আমরা [ঘরের] কোণে বসে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি।" মধ্যবিত্ত মানুষের এই চিন্তাগত দৈন্যের কারণ বলার সময় বিবেকানন্দ কাউকে রেয়াৎ করেননি। গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্যের মতো মানুষেরা যেখানে আছেন সেখানে দেশের পরিস্থিতি এর বেশি ভাল আর কী-ই বা হবে? বিবেকানন্দের রোষ আছড়ে পড়েছে : "মেলা লেখাপড়ার চর্চা হচ্ছে, লোকগুলো একটু চমচমে হয়ে উঠছে, সকল জিনিস বুঝতে চায়, চাকতে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে-সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি, তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাকো। নাকে সরষের তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা বললে—বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু! উঠে বসতে হবে, চলতে ফিরতে হবে, কি আপদ!! 'বেঁচে থাক্ কৃষ্ণব্যাল' বলে আবার পাশ ফিরে শুলো।"[১৬] এই কথাগুলি যেন একজন স্টেটস্ম্যানের কলম থেকে বেরিয়েছে যিনি তাঁর দেশবাসীর বৈষয়িক উন্নতির জন্যে সদা ভাবিত থাকেন। এই মানুষটিই বলতে পারেন, ফুটবল খেলে শরীর শক্ত হলে গীতার মর্ম অধিক বুঝবে।

তিন

দেশভ্রমণ দেশচেতনা নির্মাণ করে

এটুকু বোঝা গেল কর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দের নির্দিষ্ট তত্ত্ব ছিল। সেই তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ণ সম্পর্কেও তাঁর চিন্তা স্বচ্ছ, কাঙ্ক্ষিত পথ ধরে এগিয়েছে। তিনি জানতেন একক মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ দেশের পুনর্জাগরণ ঘটানো সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন টিমওয়ার্কের। বিবেকানন্দ বেছে নিলেন দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, ছোকরার দল যেন দুধ, একটু ফোটালেই ঠাকুরসেবায় চলে। তাই পতিত মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্যে তাঁর ভরসাস্থল স্বদেশের যুবকেরা, তাঁরা মাদ্রাজের হোন বা কলকাতার বা অন্য স্থানের। কিন্তু কী তাঁদের করতে হবে সে-বিষয়ে স্পষ্ট ধারণাও তাঁদের থাকা দরকার। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বোঝার জন্যে বিবেকানন্দ দেশভ্রমণের ওপর জোর দিলেন। গয়া-গঙ্গা-প্রভাস ইত্যাদি তীর্থস্থান আপাতত তুলে রেখে পায়ে হেঁটে মহামানবের সাগরতীর দেখতে হবে। এর প্রয়োজনীয়তার কথা অনুগামীদের তিনি বারবার বুঝিয়েছেন। এও বলেছেন : "আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজ-যন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় একটি জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে।"[১৭]

"এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার;...।"[১৮]

কোন কূপমণ্ডুক অবস্থায় ভারতবাসী আছে, তা দেখার জন্যে পৃথিবীর উন্নত দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেবল পাশ্চাত্য নয়,

বিবেকানন্দ যোগ করলেন, উন্নতিশীল প্রাচ্য জাপান ও চিনের দিকেও চোখ ফেরানোর কথা। এই প্রসঙ্গে আলাসিঙ্গা পেরুমল ও অন্যদের লেখা বিবেকানন্দের চিঠির ভাষা অগ্নিবর্ষী। অন্য সভ্যতার ধারাবাহিক উন্নতির পাশে জবুথবু ভারতীয় সভ্যতা কিংবা কালাপানি পেরোতে অনিচ্ছুক মানুষের আহাম্মকির উল্লেখ এখানে যেমন আছে, তেমনি আছে পুরোহিততন্ত্রের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিবরণও : ''এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনও শুধরোবে না। তাদের হৃদয়ের কখনও প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব; আগে তাদের নির্মূল কর।''[১৯] ''আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু-ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরিবদের জন্য কি করছেন? খালি বলছেন, 'ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না'।... এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।''[২০]

অন্যত্র একই মন্তব্য : ''এ সংসার—'দেখ্ তোর, না দেখ্ মোর', কেউ কারু জন্য দাঁড়িয়ে আছে? ওরা দশ চোখ, দু-শ হাত দিয়ে দেখছে, খাটছে; আমরা—'গোঁসাইজী যা পুঁথিতে' লেখেননি—তা কখনই করব না; করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার!! দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টাও তো অষ্টরম্ভা; খালি চিৎকার হচ্ছে; বস্! কোণ থেকে বেরোও না—দুনিয়াটা কি, চেয়ে দেখ না। আপনা আপনি বুদ্ধিসুদ্ধি আসবে।''[২১]

আসলে দেশভ্রমণ আক্ষরিক অর্থে বিবেকানন্দের চোখ খুলে দিয়েছিল। তাই ইউরোপীয়দের পোশাকি ফ্যাশন নিয়ে কথা বলার সময়ে বিবেকানন্দ চলে গেলেন পোশাককেন্দ্রিক ব্যবসায়ের মধ্যে। বললেন, ''এ-সব দেশের [পাশ্চাত্যের] পশম-রেশম-তাঁতিদের নজর দিনরাত—কি বদলাচ্ছে বা না বদলাচ্ছে, লোকে কি রকম পছন্দ করছে, তার উপর; অথবা নূতন একটা করে লোকের মন আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। একবার আন্দাজ লেগে গেলেই সে ব্যবসাদার বড়মানুষ।'' তৃতীয় নেপোলিয়নের রানি ইউজেনি কাশ্মিরি শাল পছন্দ করতেন। সুতরাং তাঁর পছন্দের অনুকরণে ইউরোপ প্রতি বছর ''লাখো টাকার শাল... কিনত।'' কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের পর কাশ্মিরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা গরিব হয়ে গেল। কারণ ''আমাদের দেশের লোক দাগাই বুলোয়; নূতন একটা কিছু করে সময়মতো বাজার দখল করতে পারলে না...।''[২২] সুতরাং দুনিয়া চেয়ে দেখলে 'আপনা আপনি বুদ্ধিসুদ্ধি আসবে।' যুবকদের মধ্যে এই চেতনার সঞ্চার করতেই চেয়েছিলেন বিবেকানন্দ।

চার
কর্মীদের চরিত্রগঠন : বিবেকানন্দের উৎসাহদান

বিবেকানন্দ সব থেকে বেশি জোর এখানেই দিয়েছেন। একজন রাজনৈতিক মানুষ যেভাবে তাঁর দলীয় কর্মীদের গড়ে তুলবেন, ধর্মীয় আচার্যের পথ নিশ্চয়ই তার থেকে আলাদা হবে। পুনশ্চ আমরা আলোড়িত হচ্ছি এই ভেবে যে, এই প্রথম একজন ধর্মনায়ক তাঁর সঙ্ঘ তৈরির সময় যেমন সাধুদের সঙ্গে গৃহীদেরও সমগুরুত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর কর্মিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন গৃহিযুবক ও সন্ন্যাসিযুবক উভয়কেই। তবে কর্মীদের চরিত্রগঠনের ব্যাপারে বিবেকানন্দের অতিসতর্কতা চোখে পড়ে। তিনি জানতেন অর্থের প্রবল স্রোত কর্মীদের চরিত্র ভ্রষ্ট করতে পারে। তাছাড়া অন্য লোভ ইত্যাদি তো আছেই। সুতরাং সবিশেষ জোর দিয়েছেন চরিত্রগঠনে। যাঁরা বিবেকানন্দের পতাকা বহন করবেন তাঁদের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হবে নীতিবাদী হওয়া (কিন্তু দয়ামায়া ভালবাসা ইত্যাদি

সূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহকে তিনি নির্বিচারে বলি দিতে চাননি। সেকথায় একটু পরে যাব)। শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা তাঁর চিঠি মূলত চরিত্রনির্মাণের উৎসাহবাণীতে ভরপুর :

''পবিত্র, বিশুদ্ধস্বভাব, এবং নিঃস্বার্থপ্রেমসম্পন্ন হও। দরিদ্র, দুঃখী, পদদলিতদিগকে ভালবাসো; ভগবান্ তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন।... ভয় ত্যাগ কর, প্রভু তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছেন।''[২৩]

''হে বীরহৃদয় মহান্ বালকগণ! উঠে পড়ে লাগো! নাম, যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কার্য কর।... তোমাদের সকলের উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক! তাঁহার শক্তি তোমাদের সকলের ভিতর আসুক—আমি বিশ্বাস করি, তাঁহার শক্তি তোমাদের মধ্যেই রহিয়াছে।... মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে।... বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, জনসাধারণকে এবং দরিদ্রদিগকে সুখী করিতে হইবে।''[২৪]

অন্য একটি চিঠি ব্যক্তিমানুষ আলাসিঙ্গাকে উদ্দেশ করে লেখা হলেও তার মধ্যে সামগ্রিকভাবে কর্মীদের চরিত্রগঠনের কথা আছে : ''তোমাকে সমস্ত জিনিসটার ভার নিতে হবে, সর্দার হিসাবে নয়, সেবকভাবে—বুঝলে? এতটুকু কর্তৃত্বের ভাব দেখালে লোকের মনে ঈর্ষার ভাব জেগে উঠবে—তাতে সব মাটি হয়ে যাবে।... হে বীরহৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের 'ঘেউ ঘেউ' ডাকে ভয় পেও না—এমনকি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেও না—খাড়া হয়ে ওঠ, ওঠ, কাজ কর।''[২৫] যে-আত্মবিশ্বাসের উল্লেখ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেকানন্দ করেছেন তা যেন রামকৃষ্ণের কথাই স্মরণ করায় যখন তিনি বলতেন—মোড় ঘুরিয়ে দে। কামাদি রিপু তো যাবার নয়, শুধু মোড় ঘুরিয়ে দিতে হয়। বিবেকানন্দ সেই কথাই কিন্তু অন্যভাবে বললেন—ক্লীবতার মোড় ঘুরিয়ে আত্মবিশ্বাসী হবার কথা। এবং আত্মবিশ্বাসী মানুষ যেকোনও কাজে প্রবল উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

বিবেকানন্দের কিছু কথা কার্যত বেদবাক্যের মতো যা দেশকাল-নির্বিশেষে সকল কর্মীদের প্রতি আহ্বান : ''কার্যের সামান্য আরম্ভ দেখিয়া ভয় পাইও না, কাজ সামান্য হইতেই বড় হইয়া থাকে।''[২৬] ''কাজ কর, কাজ কর—সকলকে তোমার ভালবাসার দ্বারা জয় কর।''[২৭]

''তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ।''[২৮]

''আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই; তাইতে কিছুই হয় না, কেউ মানে না!''[২৯]

''সর্বোপরি আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে।... হে প্রভু, কবে মানুষ অপর মানুষকে ভাইয়ের ন্যায় দেখিবে?''[৩০]

এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া জরুরি—তাঁর ত্যাগী ভক্তদের জন্যে বিবেকানন্দের রীতিমতো অহংকার ছিল। হরিদাস বিহারীদাসকে লেখা চিঠিতে তার প্রমাণ মেলে। বিবেকানন্দ নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন এই যুবকদের সঙ্গে। তাঁর সেই ভালবাসার পরিচয় এইভাবে পেয়েছি :

''প্রভুর কৃপায় ইহারা এমন কাজ করিয়া যাইবে, যাহার জন্য সমস্ত জগৎ যুগের পর যুগ ইহাদিগকে আশীর্বাদ করিবে।... আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি।''[৩১]

পাঁচ
নতুন ভারতগঠনে বিবেকানন্দের কর্মপরিকল্পনা

ধরে নেওয়া যাক বিবেকানন্দের স্বপ্ন সাকার করার জন্য কর্মিদল গঠিত হল। কিন্তু ব্যাপারটি সফল করার জন্য পরিকল্পনার দরকার।

উলটোদিকে, নিছক কিছু কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য আচার্য বিবেকানন্দ আবির্ভূত, এটাও মেনে নেওয়া কঠিন। তবে তাঁর বাস্তব জ্ঞান কাজের কিছু দিশা দেখিয়েছে। কয়েকজন ঘনিষ্ঠকে সেসব পরিকল্পনার কথা তিনি বলেছেন যাঁদের মধ্যে আছেন মাদ্রাজি ভক্তগণ কিংবা তাঁর গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অথবা হরিদাস বিহারীদাস এমনকী মহীশূরের মহারাজা পর্যন্ত। সেই কথাগুলি আজও স্মর্তব্য বিশেষত যখন শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকারি চেষ্টা অব্যাহত। বনের বেদান্তকে ঘরে আনার এই চেষ্টা সরাসরি উদ্ধার করছি :

''একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণ লোকের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত প্রচারকগণের দ্বারা গরীবের বাড়িতে বাড়িতে যাইয়া তাহাদের নিকট বিদ্যা ও ধর্মের বিস্তার—এই ভাবগুলি প্রচার করিতে থাকো। সকলেই যাহাতে এ বিষয়ে সহানুভূতি করে, তাহার চেষ্টা কর।''[৩২]

''ধরুন, যদি আমরা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিতে সক্ষমও হই, তবু দরিদ্রঘরের ছেলেরা সে-সব স্কুলে পড়িতে আসিবে না; তাহারা বরং ঐ সময় জীবিকার্জনের জন্য হালচাষ করিতে বাহির হইয়া পড়িবে।... দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে (অর্থাৎ নিজেরা শিক্ষালাভে তৎপর না হয়), তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সবস্থানে যাইতে হইবে।... মনে করুন, কোন একটি গ্রামের অধিবাসীগণ সারাদিনের পরিশ্রমের পর গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া কোন একটি গাছের তলায় অথবা অন্য কোন স্থানে সমবেত হইয়া বিশ্রম্ভালাপে সময়াতিপাত করিতেছে। সেই সময় জন-দুই শিক্ষিত সন্ন্যাসী তাহাদের মধ্যে গিয়া ছায়াচিত্র কিংবা ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে কিংবা বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ছবি দেখাইয়া কিছু শিক্ষা দিল। এইরূপে গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে মুখে মুখে কত জিনিসই না শেখানো যাইতে পারে দেওয়ানজী!''[৩৩]

''শশী, তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্যে পরিণত করতে পারিস তবে জানব তোরা মরদ, আর কাজে আসবি। হরমোহন, ভবনাথ, কালীকৃষ্ণবাবু, তারক-দা প্রভৃতি সকলে মিলে একটা যুক্তি কর। গোটাকতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু chemicals (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরীব-গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography (জ্যোতিষ, ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও আর 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' উপদেশ কর—কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খুলে, তাই চেষ্টা কর—সন্ধ্যার পর, দিন-দুপুরে—কত গরীব মূর্খ বরানগরে আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও—চোখ খুলে দাও। পুঁথি-পাতড়ার কর্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও। তারপর ধীরে ধীরে centre extend কর—পারো কি? না, শুধু ঘণ্টা নাড়া?''[৩৪]

ছয়

চলিষ্ণু এই কর্মবাদ

বিবেকানন্দ জীবনকে গতিশীল করতে চেয়েছিলেন। আকারে বৃহৎ অথচ কর্মে স্থাণু ভারতের পরিবর্তে নতুন ভারতের স্বপ্ন তাঁর অস্থিমজ্জায় মিশেছিল। এই সত্য আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্‌গীরণের মতো তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে। তেমন ভাষা বিবেকানন্দ ভিন্ন আর কে লিখতে পারেন : ''নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপ্‌ড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে।

বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"[৩৫]

বিবেকানন্দ কিন্তু উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত মানুষকে নিয়ে নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখলেন না। যে-দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত তিনি চষে বেড়িয়েছেন তারই অতি সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর অন্তহীন ভরসা। কারণ তাদের মধ্যেই আছে 'অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা'। বিবেকানন্দ এইখানে থামতে পারতেন, থামেননি। যোগ করেছেন আরও কয়েকটি শব্দ যেখানে আছে—বড় কাজের সময় অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়—কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কাজে যারা নিরন্তর নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখায়, ভারতের সেই শ্রমজীবীদের প্রতি তাঁর প্রণাম রইল।

—এই বাক্যগুলির নিহিতার্থ আমাদের অন্তস্তল কাঁপিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে এখানে আছে সতর্কবার্তাও। যাদের উন্নতির জন্যে বিবেকানন্দ-অনুগামীরা কর্মনিষ্ঠ হবেন, সেই অতিসাধারণ মানুষদের স্বয়ং বিবেকানন্দ প্রণাম জানিয়েছেন। এই প্রণামের মাধ্যমে বিবেকানন্দ যুগান্ত সৃষ্টি করে গেলেন। নির্মাণ করলেন এক অত্যাশ্চর্য কর্মবাদ যার অক্ষরে অক্ষরে লেখা রইল—নিষ্কাম কর্ম করে মোক্ষলাভ করা যায়—বিবেকানন্দ এই কর্মসংস্কৃতির প্রবক্তা মহান আচার্যপুরুষ।

তথ্যসূত্র

১। কর্মের দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়, বিবেকানন্দ তা সুস্পষ্টভাবে তাঁর কর্মযোগ গ্রন্থে লিখেছেন : ''সকল কর্মের উদ্দেশ্য—মনের ভিতরে পূর্ব হইতে যে শক্তি রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ করা, আত্মাকে জাগাইয়া তোলা। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে এই শক্তি আছে এবং জ্ঞানও আছে। এই-সকল বিভিন্ন কর্ম যেন ঐ শক্তি ও জ্ঞানকে বাহিরে প্রকাশ করিবার, ঐ মহাশক্তিগুলিকে জাগ্রত করিবার আঘাত স্বরূপ।" (*স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা,* উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), খণ্ড ১, পৃঃ ৪০ [এরপর, *বাণী ও রচনা*]

২। দ্রঃ *তদেব*, পৃঃ ৫৮

৩। দরিদ্রের উপর সাধু ও ব্রাহ্মণের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনি বলার সময় বিবেকানন্দের মুখের পেশি ঘৃণায় কীভাবে শক্ত হয়ে উঠেছিল তা তাঁর ভাষা পড়েই বোঝা যায়। ১৯ মার্চ ১৮৯৪-তে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছেন : ''ওরে ভাই, দক্ষিণ দেশে যা দেখেছি, উচ্চজাতির নীচের উপর যে অত্যাচার! মন্দিরে যে দেবদাসীদের নাচার ধুম!... আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের 'ছুঁৎমার্গ', খালি 'আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না'।... যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরিবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য!" ২৮ ডিসেম্বর ১৮৯৩-এ হরিপদ মিত্রকে লেখা চিঠিতে বিবেকানন্দের একই বক্তব্য চোখে পড়ে।

৪। ২৬ মে ১৮৯০-তে প্রমদাদাস মিত্রকে বিবেকানন্দ চিঠিতে লিখলেন তাঁর গুরুর আদেশের কথা : ''তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত।... যদি ভগবান্ রামকৃষ্ণের সমাধি এবং তাঁহার শিষ্যদিগের বঙ্গদেশে গঙ্গাতটে আশ্রয়স্থান হওয়া উচিত বিবেচনা করেন, আমি আপনার অনুমতি পাইলেই ভবৎসকাশে উপস্থিত হইব এবং এই কার্যের জন্য, আমার প্রভুর জন্য এবং প্রভুর সন্তানদিগের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি।"

৫। ৪ জুলাই ১৮৮৯-তে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা বিবেকানন্দের চিঠিতে তপস্যার জন্যে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা চোখে পড়ে। তিনি লিখেছেন :

''ভগবানের ইচ্ছায় গত ৫/৭ বৎসর আমার জীবন ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট।''

৬।স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০) পৃঃ ৪১

৭।*তদেব*, পৃঃ ৪৬

৮।২৬ অক্টোবর ১৮৯৩ অধ্যাপক ডব্লু এইচ রাইটকে লেখা চিঠি

৯।*বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৬ (২০০১), পৃঃ ১২১

১০।মহানির্বাণ তন্ত্র থেকে শ্লোক উদ্ধার করে স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন গৃহস্থ-জীবনের লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, সৎপথে জীবিকার্জন, অতিথিসেবা, পরিবারের প্রতিপালন, সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষাদান ইত্যাদি। তদুপরি ''নিজ যশ পৌরুষের বিষয়, অপরের কথিত গুপ্তকথা, এবং অপরের উপকারার্থ তিনি যাহা করিয়াছেন, ধর্মজ্ঞ গৃহস্থ তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন না।... কর্ম্ম-যোগের যাবতীয় নীতিরাজিকে কার্য্যে পরিণত করাই গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য। কর্ম্ম-যোগের ইহাই এক প্রধান অংশ—সর্ব্বদা ক্রিয়াশীলতা—ইহাই গৃহস্থের কর্তব্য।'' (*বাণী ও রচনা*, খণ্ড ১, ২০০১, পৃঃ ৫৩-৬৩)

১১। *তদেব*, পৃঃ ৫৩

১২। *তদেব*, পৃঃ ৫৮

১৩। গৃহীর ধর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেছেন :

''বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড—নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর,তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই। এটি শাস্ত্রের মত। সত্য,সত্য, পরম সত্য—স্বধর্ম কর হে বাপু! অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জন করে স্ত্রী-পরিবার দশজনকে প্রতিপালন—দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে তো তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও— আবার 'মোক্ষ'!!'' (*বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৬, পৃঃ ১২০-২১)

১৪। *তদেব*, পৃঃ ১২২-২৩

১৫। *তদেব*, পৃঃ ১২০

১৬। *তদেব*, পৃঃ ৩৭

১৭। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ খেতড়িনিবাসী পণ্ডিত শংকরলালকে লেখা চিঠি

১৮। ১০ জুলাই ১৮৯৩ আলাসিঙ্গা পেরুমল ও অন্য মাদ্রাজি ভক্তদের লেখা চিঠি

১৯। *পত্রাবলী*, পৃঃ ৭২

২০। ২৮ ডিসেম্বর ১৮৯৩ হরিপদ মিত্রকে লেখা চিঠি। একই বক্তব্য দেখি কয়েক মাস পরে ১৯ মার্চ ১৮৯৪ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে।

২১। *বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৩১-৩২

২২। *তদেব*, পৃঃ ১৩১

২৩। ২ নভেম্বর ১৮৯৩ আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা চিঠি। একই কথা এর আগেও লিখেছেন।

২৪। *পত্রাবলী*, পৃঃ ১৩৮-৩৯

২৫। *তদেব*, পৃঃ ১৮২-৮৪

২৬। *তদেব*, পৃঃ ১৪০

২৭। *তদেব*, পৃঃ ১৬৯

২৮। *তদেব*, পৃঃ ১৮৪

২৯। *বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৬, পৃঃ ৬৪

৩০। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ শংকরলালকে লেখা চিঠি

৩১। ২৯ জানুয়ারি ১৮৯৪ হরিদাস বিহারীদাসকে লেখা চিঠি

৩২। ২৪ জানুয়ারি ১৮৯৪ মাদ্রাজি ভক্তগণকে লেখা চিঠি

৩৩। ২০ জুন ১৮৯৪ হরিদাস বিহারীদাসকে লেখা চিঠি

৩৪। ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠি (২৯ জানুয়ারি ১৮৯৪ হরিদাস বিহারীদাসকে লেখা চিঠিতে, ১৯ মার্চ ১৮৯৪ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকেই লেখা চিঠিতে একই কথা পেয়েছি)

৩৫। *বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৬, পৃঃ ৬৪-৬৫